স্বাগতম

কনকেন্দু ভৌমিক

ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক)বাংলা

সিরাজগঞ্জ

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

বঙ্গভাষা

- কবি পরিচিতি
- উৎস পরিচিতি
- ছন্দ
- নির্মান শৈলীঃ সনেট

কবি পরিচিতি

নামঃ মাইকেল মধুসূধন দত্ত

জন্ম ঃ ১৮২৪ সালের ২৫ শে জানুয়ারি, যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে ।

সাহিত্য সাধনা ঃ মহাকাব্য ঃ মেঘনাদ-বধ কাব্য

নাটক: শর্মিষ্ঠা,পদ্মাবতী,

প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ

মৃত্যুঃ ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন কলকাতায় ।

উৎস পরিচিতি

- ১৮৬০ সালে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠি দিয়ে বলেন তিনি (কবি) মাতৃভাষায় সনেট লেখা শুরু করেছেন । পরবর্তী কালে এটাই বঙ্গভাষা।

ছন্দ

বঙ্গভাষা কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত । প্রতিটি স্তবকে ১৪ মাত্রার দুটি অংশ থাকে।প্রথম পর্ব ৮মাত্রার ও দ্বিতীয় পর্ব ৬ মাত্রার ।

কীর্তিসমূহ

- মহাকাব্য
- সনেট
- কবিতা
- নাটক
- কমেডি
- ট্র্যাজেডি
- প্রহসন

নির্মান শৈলীঃ সনেট

- একটি সনেটে ১৪ টি পঙক্তি থাকে। ওই ১৪ টি পঙক্তি ৮ ও ৬ টিতে বিভক্ত থাকে । প্রথম ৮টি কে বলে অষ্টক ২ য় ৬টি কে বলা হয় ষষ্টক ।

আলোচনা

- কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের প্রথম ভাগে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন।পরে তিনি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে বিলেতে যান।কবি বুঝতে পারেন মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা না করলে তিনি অমর হতে পারবেন না ।

শিক্ষণীয় বিষয়

- মহাকাব্য কি ?
- সনেটের্ উৎপত্তি
- নাটকের প্রকারভেদ

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

জন্মঃ ১৮৬১ সালের ৭মে; ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে।
মৃত্যুঃ ৭ আগস্ট ১৯৪১ ; ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮।
#ব্যক্তিগত তথ্যঃ
★বাবা- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; মা- সারদা দেবী।
★তিনি পিতামাতার ১৪শ সন্তান।
★তাঁরা খুলনা দক্ষিণডিহি থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন।
★তাঁরা ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী।
★বাংলা সাহিত্যে ১ম সব্যচাসী লেখক।
★১৮৮৩ সালে ভবতারিণী দেবী/মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন।(খুলনা)
★তাঁর বৌঠান -কাদম্বরী দেবী।
★বংশের নাম- পিরালি ব্রাহ্মণ
★পারিবারিক উপাধি- কুশারী
#উপাধিঃ
১. জীবনশিল্পী- অন্নদাশঙ্কর রায়
২. বিশ্বকবি- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
৩. কবিগুরু- ক্ষিতিমোহন সেন
৪. গুরুদেব- মাহাত্মাগান্ধী
৫. ভারতের মহাকবি- চীনা কবি চি সি লিজন
৬. কবি সার্বভৌম- সংস্কৃত কলেজ
৭. পরম গুরু- পরীর রাজ্যে

#ছদ্মনামঃ
★ভানুসিংহ ঠাকুর। এই ছদ্মনামে তিনি ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করেন।
#উপাধিঃ
★ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট উপাধি প্রদান করে- ১৯৩৬ সালের ২৯ জুলাই।
#প্রথম রচনাঃ
★১ম প্রকাশিত কবিতা- ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অভিলাষ(১৮৭৪)
★১ম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - কবিকাহিনি(১৮৭৮ সালে)
★১ম প্রকাশিত নাটক- বাল্মীকি প্রতিভা(১৮৮১)
★১ম প্রকাশিত উপন্যাস- বৌঠাকুরানির হাট(১৮৮৩)
★১ম প্রকাশিত ছোটগল্প- ভিখারিনী(১৮৭৪)
★১ম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ- বিবিধ প্রসঙ্গ(১৮৮৩)
#শেষ রচনাঃ
★রবীন্দ্রনাথ এর শেষ গ্রন্থ- শেষ লেখা। এটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
#নোবেল পুরস্কারঃ
★গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়-১৯১০ সালে। এটি একটি গীতিকবিতার বই।
★রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে এটির ইংরেজি অনুবাদ করেন Song offeringss নামে।

সোনার তরী

সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।
একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা–
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি
একেলা।
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে
পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু-ধারে–
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

- ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।
যত চাও তত লও তরণী-'পরে।
আর আছে?– আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে–
এখন আমারে লহ করুণা করে।
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

মর্মকথা

সোনার তরী কবিতার মূল বক্তব্য

‘সোনার তরী’ কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় একটি জীবনদর্শন অন্তলীন হয়ে আছে। কবিতাটি ‘একটি ছোট ধানখেত, তার চারপাশে স্রোতের বিস্তার, সোনার ধান নিয়ে। একা কৃষক, অবলীলায় তরি বেয়ে আসা মাঝি’- এই কয়েকটি চিত্রকল্প এবং এগুলোর অনুষঙ্গে রচিত। এই কবিতায় দ্বীপসদৃশ ধানখেতের চারপাশে ক্ষুরধার বর্ষার নদীস্রোত হিংস্র হয়ে খেলা করছে। সেখানে রাশি রাশি সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছে এক কৃষক, তার মনে নানা আশঙ্কা। সেখানে ভরা পালে তরি বেয়ে এক মাঝিকে আসতে দেখে কৃষকের মনে আশার সঞ্চার হয়। নিঃসঙ্গ কৃষক আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তার মনে হয় মাঝিটি তার চেনা। কিন্তু সেই মাঝি নির্বিকারভাবে তার পাশ দিয়ে অজানা দেশের দিকে তরি নিয়ে চলে যেতে থাকে। তখন কৃষক তাকে কাতর অনুনয় করে কূলে তরি ভিড়িয়ে সোনার ধানটুকু নিয়ে যেতে। মাঝি তরি ভিড়িয়ে তাতে সোনার ধান ভরে নিয়ে অজানার পথে চলে যায়। সেই তরিতে ধানের স্থান হলেও কৃষকের স্থান হয় না। আর শূন্য নদীতীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে কৃষক একা গুমড়ে মরে। এভাবে এ কবিতার রূপকল্পটি পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ যে অনিবার্য বিষয়টি এড়াতে পারে না তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষ থাকে না, টিকে থাকে মানুষের সৃষ্ট সোনার ফসলরূপী উত্তম কর্ম। এভাবে কবির সৃষ্টিকর্ম কালের সোনার তরিতে স্থান পেলেও ব্যক্তি কবির স্থান সেখানে হয় না। এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে

সোনার তরী কবিতার নামকরণ

কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত নামই সার্থক নাম। ‘সোনার তরী’ একটি রূপক কবিতা। এই কবিতায় আমরা একজন কৃষকের দেখা পাই। ভরা বর্ষায় নদীর ওপারে চরের জমিতে তিনি সোনালি রঙের পাকা ধান কাটছেন। ধান কাটতে কাটতে বেলা পড়ে এল। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।
কৃষক কাটা ধান সমেত শূন্য নদীর তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় জনৈক মাঝি একটি নৌকা বা তরী নিয়ে হাজির হলেন এবং কৃষকের সকল ধান তরীতে তুলে নিলেন। সেই তরীতে কৃষকের আর জায়গা হল না। তিনি শূন্য নদীর তীরে একাকি পড়ে রইলেন। এখানে কৃষক বলতে মানুষ, পাকা ধান বলতে ভাল কর্ম আর সোনার তরী বলতে বহমান কাল বুঝানো হয়েছে। এ কবিতার মূল বিষয় হচ্ছে মহাকাল বা সোনার তরী। কাজেই কবিতাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।
আরো পড়ুন: আত্মবিলাপ কবিতার কবির মর্মবেদনা নির্ণয় কর
উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কবিতার মূল বক্তব্য হচ্ছে মানুষ তার সমগ্র জীবনে যে কর্ম করে, যা তার কীর্তি তা মহাকাল ধরে রাখে এবং একাল থেকে সেকালে বয়ে নিয়ে যায়। তাই বলা যায়, এ কবিতার মূল বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার করলেও সোনার তরী কবিতাটির নামকরণ সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

সোনার তরী কবিতার ছন্দ,মাত্রা ও শব্দার্থ

কাব্যগ্রন্থ- সোনার তরী (নামকবিতা, যে কবিতার নামে কাব্যগ্রন্থের নাম সেই কবিতাকে নামকবিতা বলা হয়।) ছন্দ- মাত্রাবৃত্ত; **৮** মাত্রার মাত্রাবৃত্ত; পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রা, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রা

শব্দার্থ:

ভরসা → আশা, আশ্বাস, নির্ভরশীলতা, আস্থা।
ক্ষুরধারা → ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
খরপরশা → শাণিত বা ধারালো বর্শ। এখানে ধারালো বর্শার মতো।
তরুছায়া মসীমাখা → গাছ পালার কালচে রং মাখা।
আমি একেলা → কৃষক নিজে, কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা প্রকাশ করেছে।
বাঁকা জল → বাঁকা জল এখানে কালস্রোতের খেলা।
থরে বিথরে → স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।

সোনার তরীর সমাপনী মন্তব্য

সোনার তরী কবিতায় কবির উপলব্ধি হয় -
মহাকালের শোতে মানুষের জীবন-যৌবন
নিষ্ঠুরভাবে ভেসে গেলেও এই পৃথিবীতে
মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল, তথা তার দর্শন,

জ্ঞান
দৃষ্টিভঙ্গী
যোগ্যতার উপাদান
দক্ষতা
মূল্যবোধ

স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী

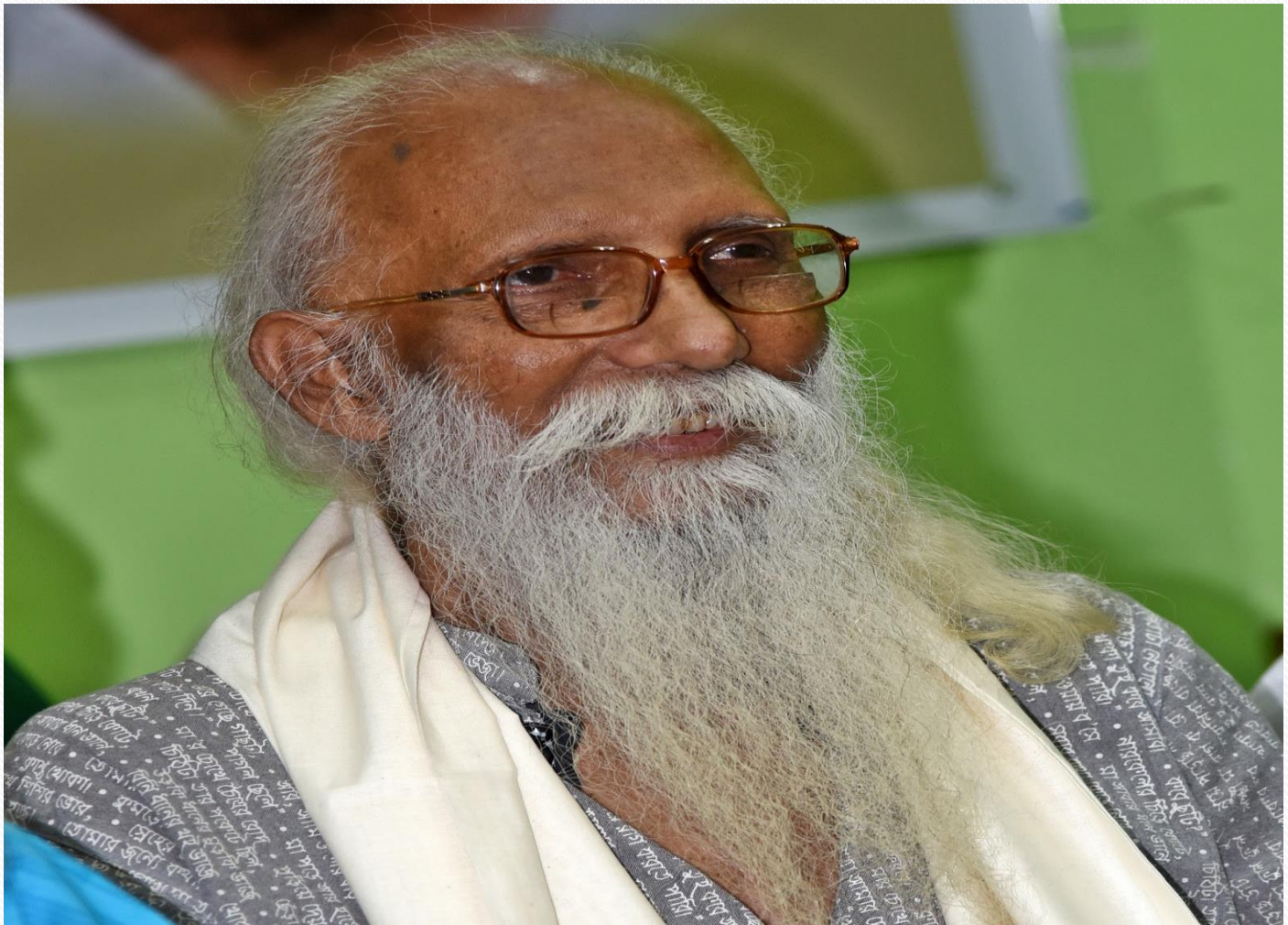

নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী

- **নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী**
- (জন্ম: জুন ২১, ১৯৪৫, আষাঢ় ৭, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), যিনি **নির্মলেন্দু গুণ** নামে ব্যাপক পরিচিত,তিনি একজন বাংলাদেশী কবি এবং চিত্রশিল্পী।
- কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্য এবং ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন। তার কবিতায় মূলত নারীপ্রেম, শ্রেণি-সংগ্রাম এবং স্বৈরাচার বিরোধিতা, এ-বিষয়সমূহ প্রকাশ পেয়েছে।
- ১৯৭০ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* প্রকাশিত হবার পর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ-গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা *হুলিয়া* কবিতাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করে তানভীর মোকাম্মেল একটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।
- এছাড়াও তার *স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো* কবিতাটি বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্য।
- এছাড়াও ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী , ২০০১ সালে একুশে পদক এবং ২০১৬ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন করেন।

স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

- একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা
- নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে
- আছেভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে ও কখন আসবে কবি?
- ”এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
- এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
- এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
- তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানেডেকে দেয়া এই ডাকার হৃদয় মাঠখানি?
- জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যতকালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ।
- কবির বিরুদ্ধে কবি, মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ, ।
- বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল
- ,উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,

পাঠ-পরিচিতি

শিক্ষার্থীদের মনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগ্রত করা কবিতাটিরউদ্দেশ্য।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রমনা রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে বজ্রকণ্ঠে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকেবাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের মধ্যেই সেদিন সূচিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ওমহান মুক্তিযুদ্ধের ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান। সেদিন কৃষক-শ্রমিক-মজুর-বুদ্ধিজীবী-শিশু-কিশোর-নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ সবাই সমবেতহয়েছিল বাঙালির মহান নেতার কথা শোনার জন্য। তার মুখে আশার বাণী শোনার জন্য।

সবার মনে ছিল আকুলতা। সে আকুলতা ছিলনেতার কাছে স্বপ্নের কথা শোনার জন্য। রমনার রেসকোর্সে যেখানে সেদিনের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল এখন সেখানে তার কোন চিহ্ন নেই।সে জায়গায় গড়ে উঠেছে শিশু পার্ক। কবি মনে করেন, অনাগত কালের শিশুদের কাছে এই কথাটি জানিয়ে দেওয়া দরকার যে এখানথেকেই, এই পার্কের মঞ্চ থেকেই বাঙালির অমর অজর প্রিয় শব্দ স্বাধীনতা কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল। আপামর জনতার সামনে যিনিসেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বাঙালির বড় প্রিয় মানুষ, বাঙালির শিকড় থেকে জেগে ওঠা এক বিদ্রোহী নেতা। সবার কোন সাধারণরাজনীতিবিদ নন- তিনি একজন কবি, একজন রাজনীতির কবি। এদেশের মানুষের ভালোবাসায় গড়া এক মানুষ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেদিন (৭ই মার্চ ১৯৭১) বিকেলের পড়ন্ত রোদে ডাক দিয়েছিলেনএবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো কবিতার মূল বক্তব্য লেখ।

- নির্মলেন্দু গুণ রচিত “স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো” কবিতায় কবি উল্লেখ করেন।
- ১৯৭১ সালের ৭ই ।মার্চ বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য শোনার জন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষা করছিলস্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ জনতা। তারা ব্যাকুল হয়ে বসেছিল বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায়।
- রেসকোর্স ময়দানে তিনি এসে কী নির্দেশ দেন, কীআশার বাণী শোনা সেজন্য সেদিন লক্ষ প্রাণ হয়েছিল আকুল। কারণ পাকিস্তানি শাসকরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালির।স্বাধিকার আন্দোলনের বিষয়কে নস্যাৎ করার সমস্ত পরিকল্পনার ছক তৈরি করে বসেছিল
- । ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুরনেতৃত্বে বাঙালির বিজয়কে তারা স্বীকার করে নিতে পারেনি। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক প্রতিভূ ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ এর ১মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধঅসহযোগ আন্দোলন। বাংলাদেশ হয়ে ওঠে গণমানুষের আন্দোলনে টালমাটাল। ক্ষুব্ধ দেশের মানুষ । ফেটে পড়ছে তাদের ক্রোধ।তারা তাকিয়ে আছে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু, প্রাণের মানুষ, কোটি মানুষের নেতা শেখ মুজিবের দিকে। সমস্ত দেশের মানুষ যেন এ ।বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেদিন রেসকোর্সের মাঠে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা
- শোনার জন্য যারা এসেছিল সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ছিল।ব্যাকুলতা, বঙ্গবন্ধু কী বলবেন আজ। প্রত্যেক শ্রোতাই যেন এক একজন বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও ।সামরিকতন্ত্রের এবং অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

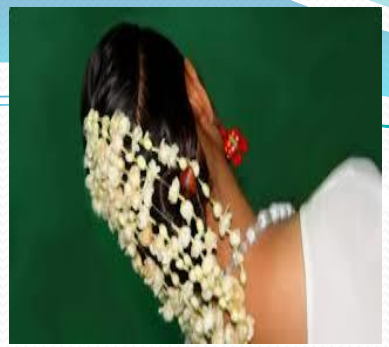

অপরিচিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরিচিতা

রচয়িতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিখন ফল

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- অপরিচিতা গল্পের নামকরণের সার্থকতা যাচাই করতে পারবে।
- গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বিবাহ ভেঙে যাওয়ার পরে অনুপমের মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! “দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।” কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি।

মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বর যাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, “বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল – পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।”

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল – এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি – কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা – এমন সময়ে সেই পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল।

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম ! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল । বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চখে, না দেখিলাম তাহার ছবি , সমস্তি অস্পষ্ট হইয়া রহিল । বাহিরে তো সে ধরা দিলই না , তাহাকে মনে ও আনিতে পারিলাম না – এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভুতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল । পছন্দ করিয়াছে বৈকি । না করিবার তো কোনো কারণ নাই । আমার মন বলে , সে ছবি তার কোন একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে । একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক – একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না ? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না ? হঠাত বাহিরে কার ও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে

দিন যায় । একটা বৎসর গেল । মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না । মার ইচ্ছা ছিল , আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন ।

এ দিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না । শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল । আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না ; সন্ধ্যা হইয়া আসে , সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায় । তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, “ আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন ।” হঠাত কোনো দিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা । জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে ।” মায়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে , “ কই কিছুই তো হয় নি বাবা ।” বাপের এক মেয়ে যে বড়ো আদরের মেয়ে । যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে

না । তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে । তার পরে ? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল । সে বলিল, “বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ – বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো ।” কিন্তু যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজ হংসের রূপ ধরিয়া বলিল, “ যেমন করিয়া আমি একদিন দয়মন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও – আমি বিরহিনীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে ।” তার পরে ? তারপরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল – এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র

নাটক "মানুষ"

মুনরি চৌধুরী

(Drama People)

- **লেখক পরিচিতি : আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী** (২৭ নভেম্বর ১৯২৫ - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ একজন বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, বাগ্মী এবং শহিদ বুদ্ধিজীবী। তিনি তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন গোপাইরবাগ গ্রামে। তিনি ছিলেন ইংরেজ আমলের একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরীর চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। কবীর চৌধুরী তার অগ্রজ, ফেরদৌসী মজুমদার তার অনুজা। ১৯৪৯-এ লিলি চৌধুরীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
- উপমহাদেশের মানুষদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ ছড়িয়ে দিতে ব্রিটিশ শোষক বেছে নেন ধর্মকে। এর ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া হয় উপমহাদেশ। ফলে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী চলে যান বহুদূরে। এটি শান্তভাবে সম্পন্ন হয়নি। লেগে যায় দ্বন্দ্ব। এক ধর্মের মানুষ আঘাত করতে থাকেন অন্য ধর্মের মানুষদের। এমনকি অনেক কাছের একজনকেও অন্য ধর্মের বলে আঘাত করা হয় মারাত্মকভাবে। শুরু হয় দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার প্রেক্ষাপট নিয়ে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন ‘মানুষ’।

ধন্যবাদ